পঁচাত্তরের বিয়োগান্ত হত্যাযজ্ঞ: রাষ্ট্র-বিপর্যয়ের সুদূরপ্রসারী নীল নকশা।

মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট-এর পর্তুষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ,নিকট আত্মীয়স্বজনসহ ১৮ জনকে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করাটি কোনো বিপদগামী সেনাসদস্যের সিদ্ধান্তে ঘটেনি। এটি ছিল একটি দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের নীল নকশা যা বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়েছিল, ব্যবহার করা হয়েছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অস্ত্র-সস্ত্র, গোলা-বারুদ, ট্যাংক এবং একদল নিষ্ঠুর প্রকৃতির বিবেকবর্জিত সেনাসদস্যকে। এর নেপথ্যে অবশ্যই সেনাবাহিনীর মধ্যে এবং বাইরে বেশকিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিও জড়িত ছিল-যারা পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের ধারা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরিয়ে নিতে ভূমিকা রাখে।

৭৫-এর পর থেকে বেশ কয়েকবছর এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে নানা রকম মনগড়া কারন ও গল্প, রাজনীতি ও সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যারা এই অপপ্রচার, মিথ্যাচার এবং ইতিহাসবিকৃতি মেনে নিতে পারছিলেন না তাদেরকে রাজনীতি,প্রশাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে কোনঠাসা করে রাখা হয়েছিল। রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উল্টো রথে তুলে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান কাটা - ছেড়া করা হয়েছিল অবলীলাক্রমে, সাম্প্রদায়িকতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধাচারণ রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিনত হয়েছিল। কার্যত বাংলাদেশ ১৯৭৫-এর পর থেকে রাজনৈতিক মতাদর্শগতভাবে দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিনত হতে যাচ্ছিল যা ছিল সম্পূর্ণরূপে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিপন্থী। এতেই প্রমাণিত হয় যে ১৫-ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অপপ্রচারে যেসব গাল গল্প বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার এবং সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে করা হচ্ছিল সেগুলো ছিল মূলতই মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তরকালে বঙ্গবন্ধু এবং তার রাজনৈতিকদলের রাষ্ট্র বিনির্মাণের ভূমিকাকে ম্লান করে দেওয়ার হীন চেষ্টা। একটি সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্থ রাষ্ট্র গঠন মোটেও সহজকাজ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর মতো দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক রাষ্ট্রের হাল ধরেছিলেন বলেই ইতিহাসের সেই কঠিনতম সময়ের জটিল দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তখন কোনো দেশী ও বিদেশী মুদ্রা ছিল না, সম্পদও ছিল না যে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে তখন অন্ন, বস্ত্র , শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ করে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হতো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায় করা, অন্যান্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা পাওয়া তখন খুবই জটিল বিষয় ছিল। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রের দায়িত্ব হাতে নেওয়ার কারণে সেসবই আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। সেই সময়ের উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করা, ভারতীয় সেনাবাহিনী সদস্যদের স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্মানের সঙ্গে দেশে ফেরত পাঠানো, ভারত থেকে ১ কোটি প্রত্যাগত মানুষের পুনর্বাসন করা , পাকিস্তান থেকে ৪ লক্ষ বাঙালিকে ফিরিয়ে আনার মতো কঠিন কাজগুলো সম্পন্ন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তিনি সাড়ে তিন বছরের মধ্যে নতুন আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন,শিক্ষানীতি প্রণয়নসহ বেশকিছু মৌলিক কাঠামো দ্বার করতে সচেষ্ট হলেন। পররাষ্ট্রনীতিতে তিনি অনুসরণ করলেন, "সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব,কারো প্রতি বৈরিতা নয়"। অভ্যন্তরীণভাবে তিনি কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার,মাটি ও মানুষকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা, শিল্প, ব্যবসা ,বাণিজ্য উদারনীতিতে রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে একটি শোষণহীন আত্মসামাজিক ব্যবস্থা উপহার দেওয়া। তিনি এটিকে সোনার বাংলা হিসেবে অবিহিত করেছিলেন। তার রাষ্ট্র চিন্তার ক্ষেত্রে কল্যানবাদি ধারণা কার্যকর ছিলো। তিনি যদিও সমাজতন্ত্রের কথা উচ্চারণ করতেন, আদর্শ হিসেবে সংবিধানেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন কিন্তু তার সমাজতন্ত্রের ধারণা চীন,রাশিয়া বা অন্যকোনো দেশ থেকে আমদানীকৃত কোনো মতাদর্শ দ্বারা নয়, নিজস্ব আলো, বাতাস, জলবায়ু, মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতির উপাদানকে বিবেচনায় নিয়ে একটি যুগোপযুগী মডেল দ্বার করাতে চেয়েছিলেন। এটিকে তিনি অভিহিত করেছিলেন প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে। তিনি সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য সোনার মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সেজন্যই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতি গঠন করার পরিকল্পনা তার ছিল। এক কথায় তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য একটি আধুনিক কল্যানবাদী রাষ্ট বিনির্মাণের যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেটি বাস্তবায়ন করতে তার সময়ের প্রয়োজন ছিল। তবে রাজনীতিতে তার ছিল নতুন উদ্ভাবনী ক্ষমতা যার কারণে এমন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ নেওয়ার বিষয়টি তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও নিতে ভয় পাননি।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতি সম্পর্কে যারা অবগত তারা বিশ্বাস করতে দ্বিধা করবেন না যে তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার অর্থে নিবেদিত রাজনৈতিক নেতা। যিনি ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে কলকাতায় প্রত্যক্ষভাবে ছাত্ররাজনীতিতে যুক্ত থেকে

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন,একটি স্বাধীন মর্যাদাশীল রাষ্ট্র পেতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু ৪৭ সালের দেশ বিভাগ তার রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়নি। পাকিস্তান একটি নিবর্তনমূলক রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হলে তিনি পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শুরু থেকেই লড়াই সংগ্রাম শুরু করেন। আওয়ামীলীগ গঠিত হওয়ার পর থেকেই তিনি এই দলটিকে পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র দলে পরিনত করেন। এর জন্য তাকে দীর্ঘ সময় কারাভোগ করতে হয়েছিল, মৃত্যুরও মুখোমুখি কয়েকবার হতে হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু একদিকে যেমন নির্ভিক ছিলেন অন্যদিকে দেশপ্রেমিক, সৃজনশীল ও মেধাবী সংগঠকও ছিলেন। ফলে তিনি জনগণের প্রধান নেতা হিসেবে আস্থাও অর্জন করতে থাকেন। এর ফলেই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ৬ দফার মতো কর্মসূচি প্রদানের মাধ্যমে পাকিস্তানকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া। সেই চ্যালেঞ্জ তিনি মোকাবিলা করেছিলেন আপোষহীন ভাবে। ফলে পূর্ব বাংলায় বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়, মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি বিশাল জনযুদ্ধ তার অনুপস্থিতিতেই সংগঠিত হয়। তখন তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। কিন্তু জনতার অন্তরে তিনি ছিলেন স্বাধীনতার মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ফিরে আসার পর তিনি শুধু বাংলাদেশ বিনির্মাণেই নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেননি, তার রাষ্ট্র চিন্তায় তখন সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে একাতন্ম রাখারও অবস্থান দৃঢ়তর হতে থাকে। বিশ্বব্যাপী তখন যে যুদ্ধ অস্ত্রের হানাহানি ছড়িয়ে ছিলো তা বন্ধ করতে সারাবিশ্বের মোড়ল শক্তি সমূহকে বারবার তিনি অনুরোধ করেছিলেন। অস্ত্রের জন্য ব্যয়িত অর্থ সারা দুনিয়ার দরিদ্র মানুষের ক্ষুধা নিবারণ ও উন্নত জীবন গড়ার কাজে বিনিয়োগ করতে আহ্বানও জানান। সেকারণে তাঁকে বিশ্বশান্তি পরিষদ দুলিও-কুরি পদকে ভূষিত করে। সেই সময় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন নামে একটি সংস্থা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলো। বিশ্ব সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বলয়ে বিভক্ত ছিল। এর বিপরীতে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ঔপনিবেশিকতার কবল থেকে মুক্ত হওয়া স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির একটি সংস্থা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সংস্থা বাংলাদেশকে সমর্থন জানিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুও স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করেন। আলদিয়ার্স সম্মেলনে তিনি যোগদান করলে তাঁকে বীরোচিত সম্মান জানানো হয়। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর দৃঢ়তার ব্যাপক প্রশংসা করেন। সেই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,"বিশ্ব আজ দুই শিবিরে বিভক্ত, একদিকে শোষক, অন্যদিকে শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে আছি"। তাঁর এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় তিনি মেহনতি সাধারণ মানুষের জন্য একটি শান্তিময় বিশ্বের স্বপ্ন দেখতেন। এই সময়ে বঙ্গবন্ধু একজন আন্তর্জাতিক পরিসরের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি ক্রমশ বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেকে উন্নীত করতে থাকেন। সেকারণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সেই সময়ের অন্যতম একজন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অসম সাহসী নেতা হিসেবে। বাংলাদেশ তার নেতৃত্বের কারণেই যেমন স্বাধীন রাষ্ট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, একইভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মর্যাদার আসন গড়ে তুলেছিল। রাষ্ট্র বিনির্মাণেও তিনি যদি সময় এবং সুযোগ পেতেন তাহলে তার উদ্ভাবিত চিন্তা কল্যানবাদি রাষ্ট্রকে পৃথিবীর একটি নতুন মডেল রাষ্ট্র হিসেবে হয়তো উপস্থাপন করে যেতে পারতেন। তাছাড়া বৈরী অর্থনৈতিক ও বৈশ্বিক প্রতিকূলতাকে তিনি সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করতেও পিছপা হতেন না। সেক্ষেত্রে তার আরাধ্য বাংলাদেশ হতো শোষিতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। কিন্তু দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা অপশক্তি তাঁর রাষ্ট্র চিন্তাকে পছন্দ করে নি। সেই সময় তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের স্বাধীনতার সংগ্রামী নেতাকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদে কোনো কোনো বিদেশী রাষ্ট্র ও সংস্থা ভূমিকা রেখেছিল। বঙ্গবন্ধু সেইসব রাষ্ট্রের সরকারের কাছে সমাদৃত হন নি। তাদের সঙ্গেই আমাদের দেশের ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন যোগাযোগ ছিলো। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা বঙ্গবন্ধু বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন সেটি দেশের অভ্যন্তরে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পছন্দের ছিল না। তারাই হাত মিলিয়েছিল পাকিস্তানসহ বিশ্বাঙ্গনে কলকাঠি যারা নাড়াতেন তাদের সঙ্গে। তাদেরই মদদে দেশে অভ্যন্তরীণ অপশক্তি রক্তাক্ত ১৫- ই আগষ্ট সৃষ্টি করে, তাদের ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ বেহাত হয়ে যায়। তবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের হাতে বাংলাদেশ গণতন্ত্র হারায়, অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পথ চলাও কণ্টকাতীর্ণ হয়ে পড়ে। এখন আমরা প্রতিবছর শোকাবহ ১৫-ই আগস্ট উপলক্ষে বাংলাদেশে দুটি ধারা দেখতে পাই। একটিতে ১৫-ই আগস্টের বেদনার কথা উচ্চারিত হয়, অন্যটিতে নীরবতা দেখতে পাওয়া যায়। এই বিভাজন আমাদের জন্য গ্লানিকর।

পিআইডি ফিচার